বাংলাদেশের খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি বিষয়ক কৌশলগত পর্যালোচনা

নির্বাহী সার-সংক্ষেপ

এস. আর. ওসমানী
দল প্রধান
আখতার আহমেদ
তাহমীদ আহমেদ
নাওমি হোসেন
সালিমুল হক
আসিফ শাহান

ভূমিকা

খাদ্য নিরাপত্তা ও পর্যাপ্ত পুষ্টি প্রতিটি মানুষের মৌলিক চাহিদা। ইন্টারন্যাশনাল কভেন্যান্ট অন ইকোনমিক, সোশ্যাল অ্যান্ড কালচারাল রাইটস (ICESCR)-এর মাধ্যমে প্রতিনিধিত্বশীল বিশ্ব সম্প্রদায় খাদ্য ও পর্যাপ্ত পুষ্টি পাবার অধিকারকে মানুষের অবিচ্ছেদ্য মৌলিক অধিকার হিসাবে বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছে এবং প্রত্যেক মানুষ এই অধিকার দাবি করতে পারে বলে সম্মত হয়েছে।

অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকেও খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টির দিকে গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। ক্ষুধা ও অপুষ্টিতে জর্জরিত জনগণের ওপর নির্ভর করে কোন দেশ শক্তিশালী অর্থনীতি তৈরি করতে পারে না। বাংলাদেশ সরকার এবং ইউনাইটেড স্টেটস এজেন্সি ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট (USAID)-এর একটি যৌথ গবেষণায় দেখা গেছে, অপুষ্টির কারণে বর্তমানে বাংলাদেশ প্রতি বছর এক বিলিয়ন মার্কিন ডলার সমমানের উৎপাদনশীলতা হারাচ্ছে এবং স্বাস্থ্য সংক্রান্ত ব্যয় হিসাব করলে এই পরিমাণ আরো অনেক বেশি হবে। তাই, বাংলাদেশ যদি ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পরিণত হতে চায় (সরকারের ঘোষণা অনুযায়ী), তাহলে দেশটিকে অবশ্যই খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি খাতে ব্যাপক পরিমাণে কার্যকর বিনিয়োগের অঙ্গীকার নিতে হবে। নিম্নের কৌশলগত পর্যালোচনার উদ্দেশ্য হলো এ বিষয়ে সরকারের উদ্যোগকে আরও শক্তিশালী করা। এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে, এবং ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG) অর্জনের সময়সীমার সাথে সামঞ্জস্য রেখে, এই পর্যালোচনায় একটি মধ্যমেয়াদী দৃষ্টিভঙ্গি গৃহীত হয়েছে।*

এ যাবত অগ্রগতি

সত্তরের দশকে ক্রমাগত খাদ্য ঘাটতিতে থাকা বাংলাদেশ আজ অনেক অগ্রসর হয়েছে। বিগত তিন দশকে একদিকে দেশের জনসংখ্যা বেড়েছে দ্বিগুণেরও বেশি, কিন্তু অন্যদিকে তার চেয়ে অধিক হারে বেড়েছে খাদ্য উৎপাদন। অবশ্য খাদ্যশস্য নয় এমন কিছু ফসল এবং অ-ফসলী খাদ্যের ক্ষেত্রে চাহিদার তুলনায় এখনো উল্লেখযোগ্য ঘাটতি রয়েছে। তবে সার্বিকভাবে এটা বলা যায় যে, অন্তত পর্যাপ্ত ক্যালরি যোগানের দিক থেকে বাংলাদেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। প্রমাণস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ২০১০ সালে দৈনিক মাথাপিছু ক্যালরি গ্রহণের হার ছিল ২,৩১৮ কিলো-ক্যালরি (kcal), যা অনুমিত ন্যূনতম আবশ্যক হার ২,১২২ কিলো-ক্যালরি থেকে যথেষ্ট বেশি।

খাবারের সহজলভ্যতার পাশাপাশি দরিদ্র জনগোষ্ঠী'সহ সকলের খাদ্যপ্রাপ্তির সুযোগও বৃদ্ধি পেয়েছে। দারিদ্র্যের হার ১৯৯১-৯২ থেকে ২০১০ সালের মধ্যে ৫৬.৬ শতাংশ থেকে দ্রুত

* বাংলাদেশের খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি বিষয়ে একটি বিস্তারিত কৌশলগত পর্যালোচনা বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির সৌজন্যে সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমান প্রতিবেদনে সেই বিস্তারিত পর্যালোচনার একটি সার-সংক্ষেপ উপস্থাপন করা হল।

হারে ৩১.৫ শতাংশে নেমে আসা থেকে এর প্রমাণ মেলে। অর্থনৈতিক অন্যান্য সূচক, যেমন প্রকৃত মজুরিও, নির্দেশ করে যে সাম্প্রতিক বছরগুলিতে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ক্রয়ক্ষমতা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে।

খাদ্য নিরাপত্তার অন্যান্য মাত্রা, যেমন খাদ্য ব্যবহারের বিষয়টি, পুষ্টির পরিপূর্ণতার সাথে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত এবং এ ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। নব্বইয়ের দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত বাংলাদেশ ও দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য রাষ্ট্রে খর্বকায়তার হার (বয়স অনুপাতে কম উচ্চতা, যা দীর্ঘকালীন অপুষ্টির একটি লক্ষণ) সাব-সাহারান আফ্রিকার তুলনায় বেশি ছিলো, যদিও সেখানকার জনগোষ্ঠী ছিলো দক্ষিণ এশিয়ার তুলনায় দরিদ্র ও স্বল্প-শিক্ষিত। এই বিসদৃশ পরিস্থিতিকে ইউনিসেফ "এশিয়ান এনিগমা" বা "এশিয়ার হেঁয়ালি" হিসাবে আখ্যা দিয়েছে। সেই সময় থেকে শুরু করে আজ অবধি বাংলাদেশ পুষ্টি ক্ষেত্রে অনেক অগ্রগতি সাধন করেছে। সাম্প্রতিক এক আন্তঃদেশীয় গবেষণায় দেখা গেছে, ১৯৯৭ থেকে ২০০৭ সালের মধ্যে শিশু অপুষ্টির হার দ্রুততার সাথে কমিয়ে আনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সর্বাধিক অগ্রসর দেশগুলির অন্যতম হিসাবে ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুদের মধ্যে খর্বকায়তার হার ১৯৯৬-৯৭ সালের ৫৫ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ২০১৪ সালে ৩৬ শতাংশে এসে দাঁড়িয়েছে। মাতৃ-অপুষ্টির হার, যা পরিমাপ করা হয় দেহের উচ্চতা ও ওজনের সূচক বা বডি ম্যাস ইনডেক্স (BMI) অনুযায়ী 'নিম্ন' মাত্রা থেকে, একই সময়কালে ৫২ শতাংশ থেকে দ্রুততার সাথে ১৭ শতাংশে নেমে এসেছে।

পুষ্টির ক্ষেত্রে এই অগ্রগতি অর্জনে সহায়ক ভূমিকা রেখেছে অনেকগুলো বিষয়। সযত্ন সংখ্যাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে কিছু সহায়ক বিষয় চিহ্নিত করা হয়েছে; যেমন: আয় ও সম্পদ বৃদ্ধি, শিক্ষা (বিশেষ করে মাতৃ-শিক্ষা), স্বাস্থ্যসেবার আওতা সম্প্রসারণ এবং পরিচ্ছন্নতা চর্চার উন্নয়ন। তবে এই সবগুলো বিষয় মিলিয়েও দৃশ্যমান উন্নয়নের কেবল অর্ধেক অংশ ব্যাখ্যা করা যায়। এ থেকে বোঝা যায় যে, আরো কিছু বিষয়ও এই অগ্রগতি অর্জনে ভূমিকা রেখেছে যা এখনও সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা যায়নি। বিভিন্ন উৎস থেকে জানা যায় যে, নারীর ক্ষমতায়ন সেগুলোর অন্যতম।

অবশিষ্ট উদ্বেগসমূহ

বিগত দশকগুলোতে উল্লেখযোগ্য অর্জন সত্ত্বেও এখনও কিছু উদ্বেগের কারণ রয়ে গেছে। প্রথমত, আশঙ্কাজনকভাবে বৃহৎ একটি জনগোষ্ঠী এখনও খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা ও ক্ষুধায় আক্রান্ত। খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার বিভিন্ন মাত্রা দ্বারা সমন্বিত একটি সূচক ব্যবহার করে সাম্প্রতিক এক গবেষণায় দেখা গেছে যে, ২০১৪ সালে দেশের মোট জনসংখ্যার এক চতুর্থাংশ অর্থাৎ প্রায় ৪ কোটি মানুষ খাদ্য নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছিল। এদের মধ্যে প্রায় ১ কোটি ১০ লক্ষ মানুষ ছিল চরম ক্ষুধার্ত। আরো বেশি সংখ্যক মানুষ বিভিন্ন দুর্যোগকালে খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার ঝুঁকিতে থাকে। তাছাড়া, জনসংখ্যার সকল অংশের অগ্রগতি সমানভাবে ঘটেনি। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর উন্নতি সচ্ছল গোষ্ঠীর তুলনায় ধীরগতিতে ঘটেছে। এখনও পরিবারে যথেষ্ট পরিমাণে খাদ্য না থাকলে নারীরাই সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হন। সাম্প্রতিক সময়ে কৃষি প্রবৃদ্ধির হার হ্রাস পেয়েছে, যা আরেকটি আশঙ্কার কারণ। বিগত পাঁচ বছরে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির হার এর পূর্বের পাঁচ বছরের তুলনায় অর্ধেক ছিল।

খাদ্য নিরাপত্তা বিষয়ে উদ্বেগের আরেকটি কারণ হল, সাধারণ জনগোষ্ঠীর প্রাত্যহিক আহারে খাদ্যের মান ও বৈচিত্র্যের ক্ষেত্রে উন্নতি খুবই সামান্য। প্রাত্যহিক আহারে শস্যের পরিমাণ এখনও সর্বাধিক; সর্বমোট শক্তি সরবরাহে শস্যের অবদান ১৯৯৫-৯৬ সালের ৭৯.৬ শতাংশ থেকে ধীর গতিতে হ্রাস পেয়ে ২০০৯-১১ সালে ৭৭ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।

পুষ্টির ক্ষেত্রেও কিছু উদ্বেগের বিষয় রয়েছে। প্রায় এক তৃতীয়াংশ শিশু এখনও খর্বকায়তায় আক্রান্ত; শিশুদের মধ্যে আশঙ্কাজনকভাবে তীব্র অপুষ্টি (বা 'স্বাস্থ্যহানি') দীর্ঘকাল ধরে প্রায় অনড় অবস্থায় রয়েছে; ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে পুষ্টি অর্জনের ক্ষেত্রে ব্যাপক তফাৎ বিদ্যমান এবং এই ব্যবধান সময়ের সাথে সাথে আরও বৃদ্ধি পাচ্ছে। পুষ্টির অবস্থা পরিমাপের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিকভাবে তুলনীয় একটি সমন্বিত সূচক 'গ্লোবাল হাঙ্গার ইনডেক্স' অনুযায়ী, ২০১৪ সালে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল 'মারাত্মক' শ্রেণীর পর্যায়ভুক্ত।

পুষ্টি ও স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে বর্তমান অগ্রগতির হার অপরিবর্তিত থাকলে বাংলাদেশ বেশ কিছু প্রতিশ্রুত লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হবে। উদাহরণস্বরূপ, ২০২১ সালের মধ্যে সরকারের পুষ্টির লক্ষ্য অর্জন করতে হলে প্রতি বছর ৫.৩ শতাংশ হারে খর্বকায়তার মাত্রা কমিয়ে আনতে হবে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সাম্প্রতিক কালে এই হ্রাসের হার ছিল মাত্র ২.৫ শতাংশ। গ্লোবাল নিউট্রিশন রিপোর্ট-২০১৪ থেকে দেখা যায় যে, ২০১২ সালে ওয়ার্ল্ড হেলথ এসেম্বলিতে গৃহীত ২০২৫ সালের জন্য নির্ধারিত কোন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রেই বাংলাদেশ সঠিক অবস্থানে নেই।

আসন্ন উদ্বেগসমূহ

বিদ্যমান সমস্যাগুলো ছাড়াও, আর্থ-সামাজিক ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে বাংলাদেশের খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি বিষয়ে আরও নতুন কিছু আশঙ্কা ঘনীভূত হচ্ছে। বিশেষত, দ্রুত নগরায়ন এবং জলবায়ু পরিবর্তনের বর্তমান ধারা ভবিষ্যৎ খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টির অবস্থার উপর নেতিবাচক প্রভাব রাখতে পারে।

নগরজীবনে চরম মেরুকরণের বহিঃপ্রকাশ হলো ক্রমবর্ধমান বস্তিগুলো, যেখানে শহরের দরিদ্রতম জনগোষ্ঠীর বসবাস। এই নগরাঞ্চলেই সমাজের হত-দরিদ্র ও অত্যন্ত ধনী মানুষেরা পাশাপাশি বসবাস করে। বাংলাদেশের নগর স্বাস্থ্য জরিপ-২০১৩ অনুসারে, নগর এলাকায় বস্তির ৫০ শতাংশ শিশুই খর্বকায়তায় আক্রান্ত, যেখানে বস্তির বাইরে এই হার ৩৩ শতাংশ।

নগরায়নের কারণে এমন কিছু সমস্যা তৈরি হচ্ছে যা শুধু নগরকেন্দ্রিক না হলেও বিশেষভাবে নগরাঞ্চলের সাথেই সম্পর্কিত। এগুলো হলো: (ক) স্বাস্থ্যসম্মত ও নিরাপদ খাদ্যের অভাব, (খ) স্থূলকায়তা বৃদ্ধি, বিশেষত নারীদের মধ্যে, এবং (গ) বাড়ির বাইরের কাজের সাথে গৃহ পরিচর্যা কাজের সমন্বয়ে জটিলতা বৃদ্ধি, যা শিশুর পুষ্টি নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করতে পারে।

জলবায়ু পরিবর্তনের বর্তমান ধারাও খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টির জন্য নেতিবাচক ফলাফল বয়ে আনতে পারে। ধারণা করা হয় যে, এই শতকের শেষে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে ফসল ফলনের হার ৩০ শতাংশ কমে আসার সম্ভাবনা আছে। এছাড়াও, কার্বন ডাই অক্সাইড নির্গমন বৃদ্ধির ফলে বাংলাদেশের প্রধান খাদ্যশস্যগুলোর পুষ্টিমান কমে আসবে। জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক ইতোমধ্যেই আয়রন ও জিঙ্কের অভাবে ভুগছে এবং এটি বিশেষত শিশু ও গর্ভবতী নারীদের স্বাস্থ্য ও পুষ্টির জন্য মারাত্মক ক্ষতির কারণ। বায়ুমন্ডলে কার্বন ডাই অক্সাইডের মাত্রা বৃদ্ধি অণুপুষ্টির ঘাটতিকে আরও বাড়িয়ে দেবে এমন আশঙ্কাও রয়েছে।

সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকাগুলোতে লবণাক্ততা বৃদ্ধির ফলেও খাদ্যে অণুপুষ্টি উপাদানের পরিমাণ বদলে যেতে পারে। ফলে চাল'সহ সকল খাদ্যে জিঙ্ক ও অন্যান্য অণুপুষ্টির পরিমাণ কমে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এছাড়াও, লবণাক্ত পানি পানের ফলে গর্ভবতী নারীদের মধ্যে রক্তচাপজনিত প্রি-এক্লাম্পশিয়া রোগ বৃদ্ধি পেতে পারে। ফলে এইসব এলাকায় শিশুদের মধ্যে কম জন্ম-ওজন ও অপুষ্টির সমস্যা তীব্রতর হতে পারে।

খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি বিষয়ক সমস্যা মোকাবেলার কর্মকৌশল

খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি বিষয়ে বিবিধ সমস্যা মোকাবেলার জন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে একযোগে উদ্যোগ গ্রহণ আবশ্যক। সাধারণভাবে বলা যায় যে, যেসব কার্যক্রম ব্যাপকভিত্তিক বা অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করার মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আয় দ্রুত হারে বৃদ্ধি করতে পারে, সেগুলো এক্ষেত্রে বিশেষভাবে সহায়ক হবে। কেননা, এর ফলে সবচেয়ে অভাবী জনগোষ্ঠীর জন্য বেশী পরিমাণে ভালো খাদ্য গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি হবে। সেই অর্থে, অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধির জন্য প্রযোজ্য নীতিমালা এবং খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি উন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্য প্রযোজ্য নীতিমালার মধ্যে বেশ সাদৃশ্য থাকা স্বাভাবিক। তবে, বর্তমান কৌশলগত পর্যালোচনায় অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় নীতিমালা বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়নি; কেননা ধরে নেওয়া হয়েছে যে, এ বিষয়ক নীতিমালার সাধারণ রূপরেখা সম্পর্কে ইতোমধ্যেই অনেকটা পরিষ্কার ধারণা তৈরি হয়েছে। বরং, বর্তমান পর্যালোচনায় এমন কিছু নীতিমালার প্রতি মনোনিবেশ করা হয়েছে যেগুলো খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টির বিবিধ মাত্রার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক। এই বিষয়গুলোকে নিম্নের আলোচনায় তিন ভাগে বিন্যস্ত করা হয়েছে: কৃষি, সামাজিক নিরাপত্তা এবং পুষ্টি বিষয়ক কর্মকান্ড।

বহুমুখী, সহনশীল এবং পুষ্টি-সংবেদনশীল কৃষি ব্যবস্থার প্রসার

প্রসারমান কৃষিখাত খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। যেমন: (ক) উৎপাদন প্রক্রিয়া: উন্নত চাষাবাদের পন্থা কৃষিখাদ্যের পরিমাণ, বৈচিত্র্য ও গুণগত মান বৃদ্ধি করতে পারে; (খ) আয়-উপার্জন প্রক্রিয়া: যেহেতু কৃষি ও আনুষঙ্গিক কর্মকান্ড এখনও গ্রামীণ পর্যায়ে আয়-উপার্জনের একটি বড় অংশ, তাই প্রসারমান কৃষি গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য খাদ্যের সংস্থান বাড়াতে পারে; (গ) বাজার প্রক্রিয়া: দ্রুত খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে খাদ্যমূল্য ক্রয়সীমার মধ্যে রাখা সম্ভব হলে যারা চাষাবাদে নিয়োজিত নন তাদেরও খাদ্যপ্রাপ্তির সুযোগ বৃদ্ধি পাবে, এবং (ঘ) সরকারি খাদ্য বিতরণ ব্যবস্থা (PFDS) প্রক্রিয়া: খাদ্যশস্যের দাম স্থিতিশীল রাখা এবং সামাজিক নিরাপত্তা-বেষ্টনীকে শক্তিশালী করা - উভয়ের জন্যই একটি শক্তিশালী সরকারি বিতরণ ব্যবস্থা জরুরী, এবং বাজারের স্বাভাবিক কার্যক্রমে বিঘ্ন না ঘটিয়ে সরকারি বিতরণ ব্যবস্থায় যোগান নিশ্চিত করতে কৃষিখাতের উন্নয়ন অপরিহার্য।

এ প্রসঙ্গে, আবশ্যকীয় কৃষি কর্মকৌশলের কিছু প্রধান বৈশিষ্ট্যের উপর আলোকপাত করা যেতে পারে। প্রথমত, কৃষিখাতে বহুমুখী উৎপাদন পরিকাঠামোর বিকাশ উৎসাহিত করা প্রয়োজন। অধিক হারে উচ্চমূল্যের কৃষিপণ্য উৎপাদন এবং বহুমুখিতা সৃষ্টির মাধ্যমে ক্ষুদ্রচাষীদের আয়-উপার্জন বৃদ্ধি করা সম্ভব হলে তাদের খাদ্য নিরাপত্তাও জোরদার হবে। একইসাথে কৃষিক্ষেত্রে বহুমুখিতা সৃষ্টির ফলে অণুপুষ্টি-সমৃদ্ধ খাদ্যপণ্যের সহজলভ্যতা বৃদ্ধি পাবে, যার ফলে সাধারণ জনগণের পুষ্টির অবস্থাও উন্নীত হবে। তবে সমস্যা হলো, কৃষি বহুমুখীকরণের উদ্যোগের ক্ষেত্রে কৃষকেরা অনেক প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়ে থাকেন যেগুলো নিরসনের জন্য প্রয়োজনীয় নীতিমালা অবলম্বন করা আবশ্যক। এসব প্রতিবন্ধকতার মধ্যে একদিকে রয়েছে ঋণপ্রাপ্তি, প্রযুক্তি ব্যবহার এবং বাজার প্রবেশ ইত্যাদির ক্ষেত্রে সুযোগের অভাব এবং অন্যদিকে রয়েছে দামী কৃষিপণ্যের মূল্যের অস্থিতিশীলতা (সীমিত বাজার পরিধির কারণে)।

উন্নত প্রযুক্তি ও খামার পদ্ধতি গ্রহণ উৎসাহিত করতে সরকার ইতোমধ্যেই কৃষিঋণ ও কৃষি-সম্প্রসারণ সেবার ক্ষেত্রে নীতিমালা প্রণয়ন'সহ বিভিন্ন কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। এগুলো ইতোমধ্যে ভালো পরিচিতি

পেয়েছে, তবে বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন কার্যক্রমগুলো থেকে অবস্থাপন্ন কৃষকরাই বেশী সেবা পাচ্ছে এবং ক্ষুদ্রচাষীদের বিরাট অংশ এই সেবার বাইরে থেকে যাচ্ছে। কৃষিঋণ পাবার ক্ষেত্রেও একই সমস্যা বিদ্যমান। ক্ষুদ্রচাষীদের প্রতি এ ধরনের বিরূপ আচরণ অবিলম্বে দূর করতে আন্তরিকভাবে উদ্যোগ নেয়া দরকার।

সমন্বিত ভ্যালু চেইন-এর ব্যবহার এক্ষেত্রে সহায়ক হবে, যেহেতু এর ফলে বহুমুখীকরণের ঝুঁকি অনেকাংশে কমে আসবে। এর একটি উদাহরণ হতে পারে চুক্তিভিত্তিক চাষ, যেখানে একজন কৃষক কোন কৃষি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সাথে নির্দিষ্ট পরিমাণ কৃষিপণ্য পূর্বধার্যকৃত মূল্যে সরবরাহের জন্য চুক্তিবদ্ধ হবেন। এক্ষেত্রে কৃষি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলোও বিভিন্নভাবে কৃষকদেরকে সেবা দিতে পারে, যেমন কৃষি উপকরণ প্রদান, কৃষি সম্প্রসারণের জন্য তথ্যোপদেশ প্রদান এবং উৎপাদিত কৃষিপণ্যের পরিবহন। বেসরকারি খাতে ইতোমধ্যে এ বিষয়ে কিছু উলেখযোগ্য উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। উপযুক্ত নীতিমালা প্রণয়নের মাধ্যমে সরকারি খাতকেও সম্পূরক ভূমিকা রাখতে হবে।

এছাড়াও, বিভিন্ন ধরনের অণুপুষ্টি-সমৃদ্ধ কৃষিপণ্য উদ্ভাবনের উদ্দেশ্যে প্রযুক্তিগত গবেষণা উৎসাহিত করতে সরকারকে উদ্যোগী হতে হবে। প্রসঙ্গতঃ বাংলাদেশ বিশ্বের প্রথম দেশ যেখানে জিঙ্ক-সমৃদ্ধ ধানের প্রজাতি উদ্ভাবিত হয়েছে যা ডায়রিয়া ও নিউমোনিয়ার প্রাদুর্ভাব কমিয়ে আনার মাধ্যমে শিশুমৃত্যু ও খর্বকায়তা হ্রাসে সহায়ক হতে পারে। এ ধরনের উদ্যোগগুলোকে আরো শক্তিশালী করা প্রয়োজন।

কৃষি কর্মকৌশল প্রণয়নের ক্ষেত্রে নারীর ক্ষমতায়নের বিষয়টিকেও গুরুত্ব দিতে হবে। সাম্প্রতিক গবেষণায় জোরালো প্রমাণ হিসাবে উঠে এসেছে যে, পুষ্টি-সংবেদনশীল কৃষির বিকাশে নারীর ক্ষমতায়ন কমপক্ষে দু'টি ভিন্ন উপায়ে ভূমিকা রাখতে পারে। প্রথমত, নারীর ক্ষমতায়ন হলে কৃষক পরিবার বহুমুখী চাষাবাদে আগ্রহী হয়ে ওঠে। দ্বিতীয়ত, নারীর ক্ষমতায়নের সাথে আচরণ পরিবর্তনের লক্ষ্যে পরিচালিত পুষ্টি বিষয়ক সচেতনতামূলক কর্মকান্ড যুক্ত হলে, বহুমুখী কৃষি পরিবারগুলোর খাদ্যাভ্যাসেও বৈচিত্র্য আসে। কেননা, তখন তারা শুধু বেশী আয়ের আশায় অণুপুষ্টি-সমৃদ্ধ কৃষিপণ্য সম্পূর্ণ বিক্রি না করে পরিবারের ব্যবহারের জন্যেও একাংশ রেখে দেন।

এসব গবেষণার ফলাফলের উপর ভিত্তি করে কৃষি মন্ত্রণালয় বর্তমানে "ওরিয়েন্টিং এগ্রিকালচার টুওয়ার্ডস ইম্প্রুভড নিউট্রিশন অ্যান্ড উওম্যান'স এম্পাওয়ারমেন্ট" শীর্ষক একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এই প্রকল্পের আওতায় দেশে বিদ্যমান কৃষি সম্প্রসারণ নেটওয়ার্কের মাধ্যমে পুষ্টি বিষয়ক কর্মকান্ড ও কৃষিবার্তার সমন্বয় করা হবে। যদিও এসব পরিবর্তনের লক্ষ্যে শুধুমাত্র কৃষি সম্প্রসারণ কর্মীদের উপর নির্ভরশীল হবার কৌশল নিয়ে আশঙ্কার অবকাশ রয়েছে। এ ধরনের আচরণ পরিবর্তন কর্মকান্ডে, বিশেষত নারীর ক্ষমতায়ন বিষয়ক কর্মকান্ডে, বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে কর্মরত বেসরকারি সংস্থাগুলো (এনজিও) যথেষ্ট সফলতার প্রমাণ দিয়েছে। বিদ্যমান এই সম্পদকে ব্যবহার না করা সমীচীন নয়, বিশেষত এমন ধরনের কাজে যেখানে তাদের পারদর্শিতা পরীক্ষিত।

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলার সক্ষমতা উন্নয়নের বিষয়টিকেও কৃষি কর্মকৌশল প্রণয়নে গুরুত্ব দিতে হবে। এই সক্ষমতা অর্জনের জন্যে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে উপযুক্ত শস্যের প্রজাতি নির্বাচন এবং যথাযথ কৃষি পদ্ধতি ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়ে কৃষকদের সচেতনতা ও সুযোগ বৃদ্ধি করতে হবে। অবশ্য, কৃষিকাজের বাইরে গ্রামীণ জীবনের অন্যান্য দিকগুলোকেও এই উদ্যোগের আওতায় আনতে হবে। সেজন্য প্রয়োজন হবে স্থানীয় পর্যায়ে জনগণকে সম্পৃক্ত করে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলার লক্ষ্যে বিভিন্ন অভিযোজনমূলক কর্মকান্ড গ্রহণ। এক্ষেত্রেও এনজিও' গুলোকে সরকারের সহযোগী হিসাবে বিবেচনায় নিতে হবে।

সামাজিক সুরক্ষা

খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টির উন্নতি সাধনে সামাজিক সুরক্ষা ও নিরাপত্তা-বেষ্টনী বিষয়ক কর্মকান্ড গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা রয়েছে। বর্তমানে সামাজিক নিরাপত্তা খাতে জিডিপি'র ২.২ শতাংশ ব্যয় করা হচ্ছে, যা সরকারি বাজেটের ১২ শতাংশ। সামাজিক নিরাপত্তা-বেষ্টনী কর্মকান্ডের আওতাভুক্ত পরিবারের সংখ্যা ২০০৫ সালের ১৩ শতাংশ থেকে বেড়ে ২০১০ সালে ২৪ শতাংশে উন্নীত হয়েছে।

কর্মকান্ডের পরিধির সম্প্রসারণ সত্ত্বেও বাংলাদেশে সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার কিছু মারাত্মক ঘাটতি রয়ে গেছে: (ক) স্বল্প পরিমাণ অর্থ বিপুল সংখ্যক কর্মকান্ডে বণ্টনের কারণে এবং দরিদ্র নয় এমন পরিবারের কাছে প্রচুর পরিমাণ সাহায্য চলে যাওয়ার ফলে জনকল্যাণে এর প্রভাব নিতান্তই অপ্রতুল, (খ) আকস্মিক অর্থনৈতিক দুর্বিপাক মোকাবেলার জন্য দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা তৈরির মত একটি অত্যাবশ্যকীয় ক্ষেত্রে সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রকটভাবে ব্যর্থ হয়েছে; এবং (গ) নগর অঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠী নিরাপত্তা ব্যবস্থার বাইরে থেকে গেছে।

এসব ঘাটতি মোকাবেলার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সরকার 'ন্যাশনাল সোশ্যাল সিকিউরিটি স্ট্র্যাটেজি (NSSS)'-এর আওতায় ভবিষ্যৎ সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমসমূহের জন্য কিছু মূলনীতি প্রণয়ন করেছে। এই কর্মকৌশল বাস্তবায়নে এমন সব কার্যক্রমকে অগ্রাধিকার দিতে হবে যা একাধারে পুষ্টি-নিবদ্ধ এবং সবচেয়ে অভাবী জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছাতে সক্ষম। এ প্রসঙ্গে, প্রধান চার ধরনের কার্যক্রম বিষয়ে নিম্নে আলোচনা করা হয়েছে: সরকারি খাদ্য বিতরণ ব্যবস্থা (PFDS), দরিদ্র ও বিপন্ন নারীদের জন্য কার্যক্রম, শিশুদের জন্য নিরাপত্তা-বেষ্টনী এবং বিদ্যালয়ে আহার প্রদান কার্যক্রম।

সরকারি খাদ্য বিতরণ ব্যবস্থা (PFDS) সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসাবে চলমান থাকা আবশ্যক। ২০০০ সালের শুরুর দিকে এই ব্যবস্থাটি সংকুচিত করে আনার পক্ষে সমর্থন বাড়ছিলো। এই চিন্তা এসেছিলো অংশত ব্যয়ের কথা বিবেচনা করে এবং অংশত এমন একটি ধারণা থেকে যে মুক্ত বাজার ব্যবস্থার মাধ্যমে খাদ্যদ্রব্যের মূল্যমান স্থিতিশীল রাখা সম্ভব হবে। তবে ২০০৮ ও ২০১১ সালে খাদ্যমূল্যের আকস্মিক বৃদ্ধির পরে এটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, বিশ্বায়নের প্রভাবে খাদ্যবাজার যেখানে ক্রমশ অস্থিতিশীল হয়ে পড়ছে এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে আরও অস্থিতিশীল হয়ে উঠতে পারে, সেখানে শুধুমাত্র মুক্ত বাজার ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে খাদ্যমূল্যের অস্থিতিশীলতা প্রশমিত করা সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে বাজারের স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে সরকারি খাদ্য বিতরণ ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

তবে PFDS-এর কার্যকারিতা বৃদ্ধির প্রশ্নে NSSS-এর একটি সাম্প্রতিক প্রস্তাবনা অত্যন্ত উদ্বেগজনক তা হল খাদ্য দিয়ে সহায়তা প্রদানের পরিবর্তে অর্থ দিয়ে সহায়তা প্রদানের দিকে সরে আসা। এ ধরনের একটি পরিবর্তনের ফলে PFDS-এর অর্থনৈতিক সক্ষমতা বিনষ্ট হবে, কেননা সেক্ষেত্রে PFDS-এর আওতায় খাদ্য মজুদের পরিমাণ ব্যাপক আকার ধারণ করতে পারে যা বিতরণ করতে গেলে বাজারের ভারসাম্য মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। যেহেতু খাদ্য বাজারের অস্থিতিশীলতা মোকাবেলার লক্ষ্যে নিকট ভবিষ্যতেও বাংলাদেশে PFDS কার্যক্রমের উপর নির্ভরশীলতা বজায় থাকবে, সেহেতু সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার আওতায় প্রদত্ত সহায়তার মধ্যে খাদ্য ও আর্থিক সহায়তার একটি যৌক্তিক মিশ্রণ রাখা বাঞ্ছনীয়।

এছাড়াও, মুক্ত বাজার কার্যক্রম ও নিরাপত্তা-বেষ্টনীভুক্ত বিক্রয়কেন্দ্রের সাহায্যে অণুপুষ্টি-সমৃদ্ধ খাদ্য বিতরণ জোরদার করার মাধ্যমে PFDS-কে আরো পুষ্টি-সংবেদনশীল করে তুলতে হবে। আন্তর্জাতিক দৃষ্টান্ত থেকে প্রমাণিত হয় যে, অণুপুষ্টির ঘাটতি ও সংশ্লিষ্ট রোগ-ব্যাধি প্রতিরোধে এটি তুলনামূলকভাবে সাশ্রয়ী ও কার্যকর একটি পন্থা।

দরিদ্র ও বিপন্ন নারীদের সহায়তা প্রদান কার্যক্রমকে সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার আরেকটি মৌলিক অংশ হিসেবে গণ্য করতে হবে। এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম হিসাবে ভালনারেবল গ্রুপ ডেভেলপমেন্ট (VGD) কার্যক্রমের কথা বলা যেতে পারে। সত্তর দশকের মাঝামাঝি সময়ে দরিদ্র নারীদের মধ্যে ত্রাণ বিতরণের জন্য এর সূচনা হয়। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে এই কার্যক্রম পরিবর্তিত হয়ে আয়ের সক্ষমতা উন্নয়নের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নেও ভূমিকা রাখছে। অতীতে সঠিকভাবে উপকারভোগী নির্ধারণে ব্যর্থতা এবং অন্যান্য অদক্ষতার কারণে VGD ব্যাপকভাবে সমালোচিত হয়েছে। তবে, দাতাগোষ্ঠীর সহায়তায় পরিচালিত স্ট্রেংথেনিং গভর্নমেন্ট সোশ্যাল প্রটেকশন সিস্টেমস ফর দি পুওর (SGSP) প্রকল্পের মাধ্যমে VGD কার্যক্রমকে বর্তমানে নতুন উদ্যমে শক্তিশালী করা হচ্ছে। এই প্রক্রিয়ার অংশ হিসাবে, সরকারের বাস্তবায়ন সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ব্যাপক প্রচেষ্টা নেয়া হচ্ছে। একইসাথে, কার্যক্রমের বিভিন্ন দিক, যেমন সঠিকভাবে উপকারভোগী নির্ধারণ, এবং কর্মদক্ষতা, কার্যকারিতা ও দায়বদ্ধতা উন্নয়নের জন্য কাজ চলছে। বর্তমানে প্রায় ৭৫০,০০০ জন নারী VGD কার্যক্রমের আওতায় সুফল পাচ্ছে।

বর্তমান VGD কার্যক্রমের লক্ষ্য হলো বিনিয়োগের জন্য নগদ অর্থ সহায়তা ও প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে উপকারভোগী নারীদের নিজেদের এবং পরিবারের জন্য সার্বিকভাবে আয়ের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা, যাতে তারা প্রকল্পের দুই বছর সময়সীমার মধ্যে চরম দারিদ্র্য ও খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার ঝুঁকি থেকে বেরিয়ে আসতে পারে। পুষ্টি বিষয়ে আচরণগত পরিবর্তনের লক্ষ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি কার্যক্রম, ফসল উত্তোলনের পর অণুপুষ্টি-সমৃদ্ধ উন্নত মানের চাল বিতরণ ইত্যাদি পুষ্টি-নিবদ্ধ পন্থা গ্রহণের মাধ্যমে এই কার্যক্রমের পুষ্টি-সংবেদনশীলতা জোরদার করা হচ্ছে। সুতরাং, দরিদ্র ও বিপন্ন নারী এবং তাদের পরিবারের জন্য খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং একইসাথে তাদের পুষ্টির অবস্থার টেকসই উন্নয়ন ঘটানোর ক্ষেত্রে বর্তমান VGD কার্যক্রমের মূল্যবান ভূমিকা রাখার ব্যাপক সুযোগ রয়েছে।

শিশুদের জন্য নিরাপত্তা-বেষ্টনী তৈরির ক্ষেত্রে বর্তমানে যেসব কার্যক্রম রয়েছে, সেগুলোর মধ্যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বৃত্তি প্রদান কার্যক্রমের পরিসর সবচেয়ে বেশি। ২০১৫ সাল পর্যন্ত, প্রাথমিক পর্যায়ের ২৪ শতাংশ এবং মাধ্যমিক পর্যায়ের ১৭ শতাংশ শিক্ষার্থী মিলিয়ে মোট ১ কোটি ৩০ লক্ষ শিশুকে বৃত্তি দেয়া হয়েছে। তবে বৃত্তির অর্থের পরিমাণ অনেক কম এবং সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এই অর্থের প্রকৃত মূল্য আরো কমে আসছে। তাই NSSS-এর প্রস্তাবনায় বৃত্তি কার্যক্রমে দু'টি মৌলিক পরিবর্তন আনার কথা বলা হয়েছে: (১) কোনরূপ লিঙ্গ-বৈষম্য না রেখে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের দরিদ্রতর অংশে বৃত্তি প্রদানের পরিসর বাড়ানো এবং (২) মূল্যস্ফীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে বৃত্তির পরিমাণ বাড়িয়ে প্রকৃত অর্থমূল্য বজায় রাখা।

আর্থিক সহায়তাকে আরো পুষ্টি-সংবেদনশীল করে তুলতে ছোট শিশুদের, বিশেষ করে দুই বছরের কমবয়সী শিশুদেরকে উদ্দেশ্য করে কার্যক্রম নেয়া আবশ্যক; কেননা জীবনের প্রথম ১,০০০ দিনে পাওয়া পুষ্টির প্রভাব সবচেয়ে শক্তিশালী হয় এবং সারাজীবন এর সুফল বজায় থাকে। বিষয়টি অনুধাবনপূর্বক, সরকার বর্তমান সহায়তা কার্যক্রমের ব্যাপক সম্প্রসারণ করে চাইল্ড বেনিফিট প্রোগ্রাম নামে একটি যুগান্তকারী পরিকল্পনা প্রণয়নের সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যার মাধ্যমে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে চার বছর বয়স পর্যন্ত শিশুদেরকে সহায়তা প্রদান করা হবে।

তবে এই কার্যক্রমের বাস্তবায়ন দূরের কথা, এটি এখনও তৈরিই হয়নি এবং এর কারণ এখনও সুস্পষ্ট নয়। এরই মধ্যে, ইনকাম সাপোর্ট প্রোগ্রাম ফর দা পুওরেস্ট (ISPP) নামে একটি কার্যক্রমে বিশ্ব ব্যাংক সহায়তার প্রস্তাবনা দিয়েছে যার আওতায় প্রস্তাবিত চাইল্ড বেনিফিট প্রোগ্রামের কিছু মূল বিষয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এখানেও বিপদের কারণ রয়েছে কেননা, এই কার্যক্রমের আওতায় শিশুদের সুফলপ্রাপ্তির বয়সসীমা চার বছর (চাইল্ড বেনিফিট প্রোগ্রামের আদি প্রস্তাবনা অনুসারে) অথবা পাঁচ বছর (ISPP কর্তৃক প্রস্তাবিত)

নির্ধারণ করলে নবজাতকের জীবনের প্রথম ১,০০০ দিনের অগ্রাধিকারের বিষয়টি হারিয়ে বা কমে যেতে পারে। কার্যক্রমটির বিভিন্ন পর্যায় পরিকল্পনার সময়ে এসব অগ্রাধিকার প্রসঙ্গকে যথাযথভাবে বিবেচনায় নিতে হবে।

বয়সে বড় শিশুদের জন্য রয়েছে দরিদ্র ও ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় পরিচালিত স্কুল ফিডিং (SF) কার্যক্রম। এ কার্যক্রমে সপ্তাহে ছয় দিন অথবা বছরে ২৪০ দিন বিদ্যালয় চলাকালে প্রাথমিক পর্যায়ের সকল শিশুকে এক প্যাকেট (৭৫ গ্রাম) করে শক্তিদায়ক বিস্কুট দেয়া হয়। এই প্যাকেটটি একজন শিশুর প্রাত্যহিক অণুপুষ্টি চাহিদার ৬৭ শতাংশ পূরণ করে থাকে। এর সাথে শিশু ও তার পরিবারের স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য অন্যান্য সেবাও প্রদান করা হয়।

অনেক সময় বলা হয়ে থাকে যে, এ ধরনের কার্যক্রম শিশুর শিক্ষা চালিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সহায়ক হলেও এটিকে পুষ্টি-সংবেদনশীল কার্যক্রম হিসাবে বিবেচনা করা যায় না। এর কারণ হিসাবে বলা হয় যে, বিদ্যালয়ে ভর্তির বয়স হওয়ার বেশ আগেই প্রথম ১,০০০ দিনের সময়সীমা পার হয়ে যায়, যার পরে আর খর্বকায়তা প্রতিরোধ করা সম্ভব হয় না। তবে এই তর্কের ক্ষেত্রে বিবেচনায় নেয়া হয়নি যে, খর্বকায়তাই বাংলাদেশের শিশুদের একমাত্র অপুষ্টিজনিত সমস্যা নয়। পাঁচ বছরের কম বয়সী প্রায় ২২ লক্ষ শিশু তীব্র অপুষ্টিতে (স্বাস্থ্যহানি) ভুগছে, এবং বাংলাদেশের ক্ষেত্রে প্রমাণিত হয়েছে যে, এই সমস্যা কমিয়ে আনার ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ে আহার প্রদান কার্যক্রম অত্যন্ত কার্যকর। তদুপরি, আন্তর্জাতিক দৃষ্টান্তে দেখা গেছে যে, এ ধরনের কার্যক্রম খর্বকায়তার প্রভাবকেও কিছু ক্ষেত্রে ফেরাতে পারে। তার সাথে এটাও অনুধাবন করতে হবে যে, প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে সঞ্চারিত খর্বকায়তা সমস্যা নিরসনেও এই কার্যক্রম কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারে। কেননা, সুশিক্ষিত পিতা-মাতা কর্তৃক সন্তানের সঠিক পুষ্টি নিশ্চিত হবার সম্ভাবনা অবশ্যই বেশি। বিদ্যালয়ে আহার প্রদান কার্যক্রমের ব্যাপক সম্প্রসারণের পেছনে এগুলো অত্যন্ত যৌক্তিক কিছু কারণ।

তবে এই কার্যক্রম পরিচালনার প্রণালী নিয়ে নতুন ধরনের চিন্তাভাবনা করার অবকাশ আছে। সম্প্রতি প্রচলিত পন্থা থেকে আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে সরে এসে সরকার স্থানীয় পর্যায়ে সহজলভ্য খাদ্যোপকরণ ব্যবহার করে বিদ্যালয়গুলোতে রান্না করা খাবার পরিবেশন করার কথা বিবেচনা করছে। রান্না করা খাবার বিস্কুটের তুলনায় আরও সুষম হওয়া ছাড়াও, এই উদ্যোগের আরেকটি সুফল হল এই যে এর ফলে স্থানীয়ভাবে বহুমুখী কৃষিকাজের সুযোগ বৃদ্ধি পাবে (বিশেষত শাক-সবজি, যা প্রায়শই নারীরা উৎপাদন করে থাকে)। বাংলাদেশে বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি (WFP) কর্তৃক পরিচালিত দু'টি পাইলট প্রকল্পে এমন দৃষ্টান্ত দেখা গেছে।

পুষ্টি-নির্দিষ্ট কার্যক্রমসমূহ

পুষ্টিহীনতা মোকাবেলা করার কর্মকৌশল নির্ধারণের সময় বিবেচনায় রাখতে হবে যে অপুষ্টির কারণ বহুমাত্রিক ও জটিল। একটি পরিবারের সম্পদ আহরণের সক্ষমতা তার পুষ্টির অবস্থানের একটি বড় নির্ধারক, তবে একমাত্র নির্ধারক নয়; এছাড়াও আরো অনেক কার্যকারণ রয়েছে। বিষয়টি আরও পরিষ্কার হয় যখন আমরা দেখি যে (ক) বাংলাদেশে এমন কিছু এলাকা রয়েছে যেখানে দারিদ্র্য সবচেয়ে প্রকট হওয়া সত্ত্বেও খর্বকায়তার হার সর্বনিম্ন, অন্যদিকে এমন এলাকাও আছে যেখানে দারিদ্রের হার কম কিন্তু খর্বকায়তার হার ব্যাপক; এবং (খ) অপুষ্টির সমস্যা শুধু দরিদ্রতম জনগোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; ২০১৪ সালের এক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, জনসংখ্যার সবচেয়ে সচ্ছল এক পঞ্চমাংশের মধ্যে পাঁচ বছরের কম বয়সী প্রতি পাঁচ জন শিশুর মধ্যে একজন খর্বকায়তায় ভুগছে। তাই পুষ্টিহীনতার প্রকোপ অতীতের চেয়ে দ্রুত হারে কমিয়ে আনতে হলে অর্থনৈতিক ও শিক্ষার অগ্রগতির পাশাপাশি পুষ্টির উপর প্রভাব সৃষ্টিকারী অন্যান্য বিষয়গুলোও চিহ্নিত করতে হবে এবং সেই অনুসারে পদক্ষেপ নিতে হবে।

এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য একটি বিষয় হল, শিশুদের মধ্যে কম জন্ম-ওজনের দীর্ঘকালীন সমস্যা; কেননা নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, কম জন্ম-ওজনের শিশুদের মধ্যে পরবর্তীকালে খর্বকায়তার ঝুঁকি অনেক বেশি থাকে। বিগত দশকে বাংলাদেশে শিশুদের কম জন্ম-ওজনের হার ছিল ৩৬-৩৭ শতাংশ, যা আন্তর্জাতিক মানের তুলনায় অত্যন্ত বেশি। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, শিক্ষা বা আর্থিক অবস্থা কোনটাই এক্ষেত্রে তেমন কোন প্রভাব ফেলে না। অপেক্ষাকৃত উচ্চশিক্ষিত (মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পন্ন করা) মায়েদের মধ্যেও ৩২.৮ শতাংশ শিশু কম ওজন নিয়ে জন্মায় এবং সবচেয়ে সচ্ছল এক পঞ্চমাংশ জনসংখ্যার মধ্যে এই হার ৩৪.১ শতাংশ। তাই কম জন্ম-ওজনের সমস্যাটি একাধারে যেমন দীর্ঘকালীন তেমন ব্যাপক। সুতরাং, পুষ্টির অবস্থার দ্রুত উন্নয়নের লক্ষ্যে গৃহীত যেকোনো কর্মকৌশলেই এই সমস্যাটির সমাধানকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

বাংলাদেশে শিশুদের কম জন্ম-ওজনের মূল কারণ ভ্রূণের পর্যাপ্ত পুষ্টি না পাওয়া, যা মূলত ঘটে মায়ের অপুষ্টির কারণে। তবে এটা অনুধাবন করা আবশ্যক যে, মায়েদের গর্ভকালীন পুষ্টি ও স্বাস্থ্যসেবা ছাড়াও আরো কিছু বিষয় এখানে জড়িত। বিশেষ করে মায়ের নিজের জন্ম থেকে শুরু করে বড় হয়ে ওঠার স্বাস্থ্যগত ইতিহাসও এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক; তার নিজের জন্ম-ওজন, শিশু অবস্থায় তার খাদ্যাভ্যাস ও যত্ন, পরিণত বয়সে তার দৈহিক উচ্চতা, গর্ভধারণের বয়স, গর্ভকালে প্রাপ্ত স্বাস্থ্যসেবা ও পুষ্টির মান সবই এখানে গুরুত্বপূর্ণ। কম জন্ম-ওজনের সমস্যা কমিয়ে আনার লক্ষ্যে এর প্রতিটি ক্ষেত্রেই কর্মসূচি নেয়া প্রয়োজন।

আরেকটি উদ্বেগের বিষয় হলো কিশোরী অবস্থায় মাতৃত্বের অবিরত উচ্চ হার, কেননা জন্ম-ওজন কম হবার পেছনে এটিও অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কারণ। আশঙ্কার বিষয় হলো, ১৫-১৯ বছর বয়সী কিশোরী মায়েদের সংখ্যা বিগত দুই দশকে কমেছে অতি সামান্যই। ১৯৯৩-৯৪ সালের ৩৩ শতাংশ থেকে এই হার ২০১৪ সালে ৩০.৮ শতাংশে নেমেছে। এক্ষেত্রে পরিবর্তন আনতে ব্যাপক আকারে সামাজিক প্রচারণা এবং আরও সুনির্দিষ্ট জন্ম নিয়ন্ত্রণ পরামর্শ আবশ্যক।

কম জন্ম-ওজনের ক্ষতিকর প্রভাব পরবর্তী জীবনে আরও ঘনীভূত হয় পুষ্টির যথাযথ মান ও খাদ্যের পরিমাণের অভাবে। অর্ধেকের বেশি কিশোরী ও প্রজননক্ষম নারীরা যে খাবার গ্রহণ করে তা পর্যাপ্ত পুষ্টি ও অণুপুষ্টি-সমৃদ্ধ নয়। এমনকি সবচেয়ে সচ্ছল এক পঞ্চমাংশ জনগোষ্ঠীর মধ্যেকার এক তৃতীয়াংশ নারীর আহারও গুণগতভাবে অপর্যাপ্ত। এর পরিণাম মা ও শিশুদের পুষ্টির জন্য মঙ্গলজনক নয়।

স্বাভাবিক ওজন নিয়ে জন্মানো শিশুও তার নাজুক বয়সে অপর্যাপ্ত খাদ্য গ্রহণের ফলে অপুষ্টিতে ভুগতে পারে। ইনফ্যান্ট অ্যান্ড ইয়াং চাইল্ড ফিডিং (IYCF) প্র্যাক্টিসেস বা নবজাতক ও কমবয়সী শিশুদের জন্য সুপারিশকৃত খাদ্যাভ্যাস অনুসারে, নবজাতকের প্রথম ছয় মাস শুধু মাতৃদুগ্ধ পান করা উচিত। ছয় মাস পূর্ণ হওয়ার সাথে সাথেই ধীরে ধীরে তাকে সম্পূরক খাবার হিসাবে যথাযথ পরিমাণে অন্যান্য পুষ্টিকর খাবার দেয়া উচিত। কিন্তু বাংলাদেশে শিশুদের জন্য এ ধরনের খাদ্যাভ্যাসের চর্চা ব্যাপকভাবে হচ্ছে না। প্রায় অর্ধেক শিশুকে প্রথম ছয় মাস শুধুমাত্র বুকের দুধ খাওয়ানো হচ্ছে না, ১৮ শতাংশ শিশুকে সঠিক সময়ের অনেক আগেই সম্পূরক খাবার দেয়া হচ্ছে, এবং ৪০ শতাংশ শিশুর ক্ষেত্রে সম্পূরক খাবার দেয়া হচ্ছে অনেক দেরীতে। এমনকি সম্পূরক খাবার শুরু করার পরেও তা পর্যাপ্ত পরিমাণে বা সঠিক পদ্ধতিতে দেয়া হয় না, যার ফলে ব্যাপক আকারে অণুপুষ্টি ঘাটতি রয়ে যাচ্ছে।

সমস্যাটি একাধারে অর্থনৈতিক ও সংস্কারজনিত। অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের জন্য কৃষির বহুমুখীকরণ উৎসাহিত করতে হবে, যাতে শস্যজাত নয় এমন নানা ধরনের খাদ্যদ্রব্য সহজলভ্য হয় এবং একই সাথে সুলভ মূল্যে অণুপুষ্টি-সমৃদ্ধ সম্পূরক খাবারের ব্যাপক সহজলভ্যতা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়। সংস্কারজনিত

সমস্যা সমাধান কল্পে এমন সব কার্যক্রম হাতে নিতে হবে যার উদ্দেশ্য হবে পুষ্টি ও শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট আচরণমালা পরিবর্তনের লক্ষ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

শিশু ও প্রাপ্তবয়স্ক উভয়ের পুষ্টির ক্ষেত্রে পানি, পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা ও পরিচ্ছন্নতার গুণগত মানের ব্যাপক প্রভাব রয়েছে। এই তিনটি বিষয়কে একত্রে WASH (water, sanitation, and hygiene) অভিধায় অভিহিত করা হয়। WASH-এর তিনটি বিষয়ের মধ্যে পয়ঃনিষ্কাশনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সবচেয়ে অগ্রসর হয়েছে। এর পরের অবস্থানে রয়েছে নিরাপদ পানির প্রাপ্যতা (যদিও তা কিছু ক্ষেত্রে আর্সেনিক দূষিত)। কিন্তু ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা চর্চা এখনও প্রত্যাশিত মাত্রার চেয়ে অনেক নিচে অবস্থান করছে। সাম্প্রতিক এক গবেষণায় দেখা গেছে, শিশু লালন-পালনকারীদের মধ্যে মাত্র ২৭ শতাংশ সঠিকভাবে হাত ধৌত করে। আশঙ্কাজনক সত্য হলো এই যে, সবচেয়ে সচ্ছল এক পঞ্চমাংশ জনসংখ্যার মধ্যেও সঠিকভাবে হাত ধৌতকারীর সংখ্যা মাত্র ৩৫ শতাংশ। এসব তথ্য থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, সাবান দিয়ে সঠিকভাবে হাত ধোয়ার বিষয়ে পরিবার ও সামাজিক পর্যায়ে ব্যাপক প্রচারণা আবশ্যক।

সবশেষে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুদের মধ্যে তীব্র অপুষ্টির (স্বাস্থ্যহানি) বিষয়ে গভীর মনোযোগ দিতে হবে, কেননা বিগত বছরগুলোতে এ বিষয়ক অগ্রগতি অতি সামান্য। স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ও কমিউনিটি ক্লিনিকগুলোতে শিশুদের মধ্যে মধ্যম ও তীব্র অপুষ্টির চিকিৎসার জন্য বাংলাদেশ সরকারের একটি সুস্পষ্ট নীতিমালা রয়েছে। কিন্তু এই কর্মকান্ডগুলো এখনও পর্যন্ত যথেষ্ট ফলপ্রসূ হয়নি। যারা ইতোমধ্যে সিভিয়ার একিউট ম্যালনিউট্রিশন (SAM)-এ ভুগছে, তাদের অকালমৃত্যুর ঝুঁকি প্রবল বিধায় তাদের জন্য বিশেষ চিকিৎসা ব্যবস্থার প্রয়োজন, যা বর্তমানে মোটেও সহজলভ্য নয়।

খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি ক্ষেত্রে শাসনপ্রণালী বিষয়ক সমস্যাসমূহ

স্বাধীন দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশের পর থেকেই বাংলাদেশে খাদ্য নিরাপত্তা বিষয়ে ক্রমাগত উদ্বেগ থাকার ফলে দেশের খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনার পরিকাঠামো অপেক্ষাকৃত উন্নত অবস্থায় এসেছে। কিন্তু পুষ্টির বিষয়টি সরকারি গুরুত্ব পেয়েছে আরো অনেক পরে, নব্বইয়ের দশকে। তাই, এ বিষয়ক শাসন পরিকাঠামোও অনেক অপরিণত এবং এখনও বিকশিত হচ্ছে। এছাড়াও, খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টির বিষয়গুলো পরস্পর সম্পর্কিত বিধায় এদের ব্যবস্থাপনাও একটি সমন্বিত পরিকাঠামোর আওতায় থাকা আবশ্যক। কিন্তু আদর্শ অবস্থা থেকে বাস্তবতা অনেক দূরে অবস্থান করছে। এক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান সমস্যা হলো, বহুবিধ পুষ্টি কর্মকান্ড বিষয়ে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব। জাতীয় পর্যায়ে বাংলাদেশ সরকারের অন্তত আটটি মন্ত্রণালয়ের অধীনে পুষ্টি বিষয়ে অর্পিত দায়-দায়িত্ব রয়েছে। কিন্তু এই মন্ত্রণালয়গুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধন বরাবরই দুরূহ প্রমাণিত হয়েছে।

পুষ্টি বিষয়ক শাসনপ্রণালীর সংস্কার সাধন করতে গিয়ে শাসন পরিকাঠামোর উভয় প্রান্তকেই বিবেচনায় নিতে হবে। উপর প্রান্তে, কর্মকান্ডের অপ্রয়োজনীয় পুনরাবৃত্তি এড়ানো এবং নানাবিধ কার্যক্রমের মধ্যে সম্ভাব্য আন্তঃসংযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে জোরালো ও কার্যকর সমন্বয় প্রয়োজন। সেই লক্ষ্যে নতুন প্রণীত জাতীয় পুষ্টি নীতিমালায় একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। এর আওতায় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়কে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মধ্যে প্রধান সমন্বয়ক এবং বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি কাউন্সিল (BNNC)-কে পুনর্বিন্যস্ত করে সর্বোচ্চ আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয়ক সংস্থা হিসাবে নিযুক্ত করা হয়েছে।

নিচের প্রান্ত অর্থাৎ মাঠ পর্যায়ে, যেখান থেকে প্রকৃত সেবা প্রদান করা হয়, সেখানেও কিছু বিষয়ে মনোযোগ দেয়া প্রয়োজন। প্রথমত, পুষ্টি সেবা প্রদানে কমিউনিটি ক্লিনিকগুলোকে প্রধান ভূমিকা পালন করার দায়িত্ব দিতে হবে। তবে যেহেতু মাঠকর্মীরা এতকাল পুষ্টি বিষয়ের তুলনায় স্বাস্থ্য ও জন্ম নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক কাজ বেশি করেছেন, তাই পুষ্টি সেবা প্রদানে তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি করে সেবার মানোন্নয়ন করতে হবে। দ্বিতীয়ত, কমিউনিটি ক্লিনিকগুলোকে আরও শক্তিশালী করে তোলার লক্ষ্যে সারা দেশব্যাপী গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর সেবাদানে নিয়োজিত বিভিন্ন এনজিও'র বিশেষায়িত দক্ষতা ও অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানোর জন্য আন্তরিক প্রচেষ্টা নিতে হবে।

চূড়ান্ত পর্যবেক্ষণ

বাংলাদেশ সরকার দেশের নাগরিকদের খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা ও অপুষ্টি দূরীকরণে অঙ্গীকারবদ্ধ। এক্ষেত্রে যেমন লক্ষ্যমাত্রা বা প্রতিশ্রুতির কমতি নেই, তেমনি নীতিমালা ও কার্যক্রমেরও ঘাটতি নেই। তবে অনতিবিলম্বে এসব লক্ষ্য অর্জন করতে হলে, সদিচ্ছাকে কার্যকরভাবে বাস্তবে রূপান্তরিত করতে হবে, এবং সে লক্ষ্যে বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ ও দায়বদ্ধতার বিষয়গুলোতে বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে।

রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ পরিকল্পনা (CIP) অনুসারে, খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে ৮.৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বরাদ্দ করা হয়েছিল, যার মধ্যে ৬৩ শতাংশ ছিল বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব তহবিল থেকে গৃহীত এবং অবশিষ্ট ৩৭ শতাংশ ছিল বিভিন্ন উন্নয়ন অংশীদারদের কাছ থেকে প্রাপ্ত। বর্তমান পর্যালোচনায় কৃষি, সামাজিক নিরাপত্তা ও পুষ্টি বিষয়ে যে ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণের সুপারিশ করা হয়েছে, সেগুলো বাস্তবায়নের জন্য উল্লেখযোগ্য পরিমাণে অতিরিক্ত বিনিয়োগের প্রয়োজন হবে। প্রয়োজনীয় অর্থের সঠিক পরিমাণ জানতে, বর্তমানে জাতীয় পুষ্টি নীতিমালার আওতায় 'ন্যাশনাল প্ল্যান অফ অ্যাকশান ফর নিউট্রিশন (NPAN)' বাস্তবায়নের ব্যয় নিরূপণে চলমান অনুশীলনের ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। তবে প্রাথমিক অনুমান থেকে প্রতীয়মান হয় যে, এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগের পরিমাণ খুব কম হবে না।

সরকারি বরাদ্দ বৃদ্ধির সাথে সাথে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতাও নিশ্চিত করতে হবে। স্কেলিং আপ নিউট্রিশন (SUN) আন্দোলনে যোগদানের মাধ্যমে বাংলাদেশ এ ব্যাপারে সঠিক পথে একধাপ এগিয়ে গেছে। এই আন্দোলনে যোগদানকারী দেশগুলো বিভিন্ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে গৃহীত উদ্যোগগুলোর স্পষ্টতা ও স্বচ্ছতা বজায় রাখতে এবং পরবর্তীতে বিভিন্ন অংশীদারদের সাথে আলোচনার ভিত্তিতে তাঁদের মতামত ও দিক-নির্দেশনা বিবেচনায় নিতে অঙ্গীকারবদ্ধ।

মানবাধিকার ভিত্তিক কর্মপন্থা অবলম্বনের মাধ্যমে এই পদ্ধতিকে আরও জোরদার করা সম্ভব। মানুষের খাদ্য ও পর্যাপ্ত পুষ্টি প্রাপ্তির অধিকারের প্রতি জোরালো সমর্থনের মাধ্যমে সরকার মূলত স্বীকার করে নেয় যে, জনগণ এই ক্ষেত্রে ব্যর্থতার জন্য সরকারকে দোষারোপ ও দায়ী করতে পারবে। দায়বদ্ধতার ক্ষেত্রে বর্তমান স্থবিরতা কাটিয়ে প্রয়োজনীয় গতি সঞ্চার করতে অধিকার-ভিত্তিক পন্থা গ্রহণ আবশ্যক। সুতরাং, খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি নিশ্চিতকরণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকারের আন্তরিকতা প্রমাণ করার সর্বোত্তম উপায় হল অধিকার-ভিত্তিক পন্থার মূলনীতি গ্রহণ এবং সে অনুযায়ী ২০৩০ সালের মধ্যে ক্ষুধামুক্ত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি বিষয়ক কর্মকৌশল প্রণয়ন।

সুপারিশমালা

খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা ও অপুষ্টির সমস্যা প্রকৃতপক্ষেই বহুমাত্রিক। তাই এই সমস্যা দূরীকরণে বিভিন্ন ক্ষেত্রে একযোগে পদক্ষেপ নিতে হবে। স্বাভাবিকভাবেই, এ সংক্রান্ত বিস্তারিত সুপারিশের তালিকা হবে অনেক দীর্ঘ, যেগুলো মুল সমীক্ষায় আলোচনা করা হয়েছে। এখানে ছোট পরিসরে নিচের পাঁচটি মৌলিক বার্তার মাধ্যমে এই পর্যালোচনার সুপারিশ তুলে ধরা হয়েছে:

১) বহুমুখী, সহনশীল এবং পুষ্টি-সংবেদনশীল কৃষি ব্যবস্থার প্রসার অত্যাবশ্যক।

২) টেকসই খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি অর্জনের চাবিকাঠি হিসাবে নারীর ভূমিকা অনস্বীকার্য।

৩) সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার মাধ্যমে নিশ্চিত করতে হবে যেন খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি উন্নয়নের লক্ষ্যে গৃহীত সরকারি প্রচেষ্টার সুফল সার্বজনীন হয়।

৪) প্রাসঙ্গিক জ্ঞান অন্বেষণ ও বিতরণ উৎসাহিত করা প্রয়োজন।

৫) মানবাধিকার ভিত্তিক কর্মপন্থা অবলম্বন করা বাঞ্ছনীয়।

সেপ্টেম্বর ২০১৬, ঢাকা

বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি (WFP) কর্তৃক পরিচালিত একটি স্বাধীন পর্যালোচনা

(বিভিন্ন সভায় আলোচনা এবং পূর্বতন খসড়াগুলোতে লিখিত মতামত প্রদানের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিবর্গ উদারভাবে যে জ্ঞান ও প্রজ্ঞামূলক অবদান রেখেছেন, সেগুলোকে লেখকগণ কৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার করছেন। এই পর্যালোচনার বিষয়বস্তু ও প্রকাশিত মতামত সম্পর্কিত সমস্ত দায়-দায়িত্ব একান্তভাবেই লেখকদের এবং এর কোন অংশের সাথেই বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি অথবা লেখকদের সাথে সংশ্লিষ্ট কোন প্রতিষ্ঠানকে সম্পর্কিত করা যাবে না।)

বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি, ২০১৬
ISBN: ৯৭৮-৯৮৪-৩৪-১০৪১-২
ইংরেজি থেকে অনুবাদ: নাসির উদ্দীন শেখ
ডিজাইন: শাহরিয়ার